দৈনিক বাংলা

C59

তারিখ 05 SEP 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

বাস্তবাসীদের জীবনে শিক্ষার ভূমিকা

ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী। মহানগরী শুধু ধনীদেরই নয়, গরীবদেরও বাসস্থান। এখানেও রয়েছে উন্নত মানের দালান-কোঠা, ঘর-বাড়ি ও বিদেশী সাম্প্রতিক মডেলের গাড়ি। বাজারে দেশী-বিদেশী জিনিসের অভাব নেই। ঢাকার পল্লবী ধানমন্ডি, গুলশান ও বনানীতে যেমন উচ্চবিত্তের অধিক বাস তেমন হাতীরপুল, পলাশী রেল গেট, মোহাম্মদপুর, আগারগাঁও, যাত্রাবাড়ি ও পুরাতন রেলওয়ের বস্তিগুলোতে বাস করেন বহু দরিদ্র মানুষ। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে এ মহানগরীতে লোক সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। শুধু এদেশের শহরগুলোতেই নয়, তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোতেও এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনের পর উচ্চ শিক্ষার সুযোগ বহু গ্রামে না থাকায় শহরে যেতেই হয়। চাকরি লাভের আশায়ও গ্রামের অনেক মানুষ শহরে আসে। বেশির ভাগ শিল্পকারখানা শহর এলাকায় বলেই সেখানে শ্রমিকের চাহিদা সর্বাধিক। পল্লীর অধিকাংশ লোকই কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল। এদেশে কৃষিকার্য মাত্র ছ'মাস চলে এবং বাকী ৬ মাস স্থগিত থাকে। কিন্তু লোকের সংখ্যা ক্রমবর্ধমানে বৃদ্ধি পেতেই থাকে। ফলে পল্লীর অনেক লোক বেকার হয়ে পড়ে। অধিকন্তু বেকারত্ব দূর করার জন্য জীবিকার সন্ধানে তাঁরা শহরমুখী হয়। আবার যুদ্ধ ও নদীর ভাঙ্গনে ঘরবাড়ি ধ্বংস হওয়ায় এবং চিকিৎসা ও ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ গ্রামের তুলনায় শহরে বেশি থাকায় অনেকে শহরে আসে।

এছাড়াও নানাবিধ কারণে আলো ঝলমল শহরের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে অনেকে গ্রাম ছেড়ে আসে। অন্যদিকে পল্লীতে ডাক্তার ও চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা না থাকায় অথবা চিকিৎসার খরচ বেশিরই সামর্থের বাইরে যাওয়ায় শিশু মৃত্যুর হার এখানেই বেশি। তাই অবশেষে ছিন্নমূল মানুষের ভীড় বেশি হয় শহরেই। বিশেষ করে এরা রেল লাইন ও রেল স্টেশন, স্টীমার স্টেশন, লঞ্চঘাট, রাস্তার ধারে, ফুটপাতে ও অন্যান্য পতিত জায়গায় কোনমতে মাথা গোঁজার ঠাই করে নেয়। ছিন্নমূলদের সংখ্যা দিন দিন এ হারে বাড়তে থাকলে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তাদের কল্যাণ করা কোন মহলের পক্ষেই সম্ভব নয়। এজন্যও তারা রোগ ও অন্যান্য ভোগান্তির শিকার। এসব কিছুর জন্য দায়ী অপরিচ্ছন্ন জীবন, অসুস্থ পরিবেশ এবং বস্তি সমূহের অযথা ঘনত্ব। অবশ্য এ সমস্যা অন্যান্য দেশেও আছে।

বাংলাদেশের লোকসংখ্যা বর্তমানে প্রায় ১০ কোটি। তন্মধ্যে শিক্ষিতের হার ১৯.৭০%।

এক নজরে ঢাকা মহানগরী

১। স্থাপিত ১৮৬৪
২। কর্পোরেশনে উন্নীত ১৯৭৮
৩। আয়তন (বর্তমান) ৮৮.৫০ বর্গমাইল
৪। ওয়ার্ড সংখ্যা ৭৫টি
৫। থানা সংখ্যা ১৪টি
৬। জনসংখ্যা ৬০,০৫০২৫
৭। শিক্ষিতের হার ৮০%
৮। বস্তি এলাকার সংখ্যা ৩৩টি
৯। বস্তির জনসংখ্যা প্রায় ২২ লক্ষ
১০। শিক্ষিতের হার ৯.৮%
১১। রিকশার সংখ্যা প্রায় ৮৯ হাজার।

বস্তিবাসীরা বিভিন্ন পেশায় জড়িত। তবে শিক্ষার প্রায় সব সুযোগ থেকে বঞ্চিত। কাজেই স্বভাবত ঢাকার শিক্ষিতেরা ও তাদের মধ্যকার সৃষ্ট সামাজিক সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত ও পরিবেশগত বৈষম্য দেখা যায়।

মানুষের বেঁচে থাকার তাকিদেও সৃষ্টি হয়েছে সমাজ জাতি, তথা নর-নারীর মিলনে মানবগোষ্ঠী বৃদ্ধির সূত্রে সমাজের উৎপত্তি। পরিবারই বৃহৎ সমাজের বীজ বপনকারী এবং এটাই প্রথম সামাজিক নিয়ন্ত্রণেরও পত্তন ঘটায়।

কোন দেশের উন্নয়নের গতি ধারা সংস্কৃতির মাপকাঠিতে বিচার করতে হলে সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের মনের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাচ্ছে কিনা দেখতে হবে। আসলে কোন দেশের সভ্যতার অর্থই সেদেশের সংস্কৃতি। সমাজে ব্যক্তিগত কোন উন্নতি সামগ্রিক ভাবে গণ্য নয়। দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার উন্নয়নই জাতীয় উন্নয়ন। কোন দেশের উন্নয়ন বলতে সেই দেশের ঊর্ধ্বগতিকে বুঝায়। উন্নয়ন বলতে অতীতে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বুঝাত কিন্তু বর্তমানে উন্নয়নের ধারণা বহুমাত্রিক। কোন দেশের উন্নয়ন বলতে সে দেশের শিক্ষা স্বাস্থ্য সাংস্কৃতি, চিকিৎসা, অর্থ, কৃষি ইত্যাদির সামগ্রিক উন্নতিকে বুঝায়।

উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য হল ঃ (১) শিক্ষিতের বৃদ্ধির হার (২) মাথাপিছু ক্যালোরি/ভোগপুষ্টি (৩) মাথাপিছু গড় আয় (৪) মাথাপিছু স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় (৫) মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহার (৬) সংবাদপত্রের কল্যাণমূলক প্রচার (৭) বার্ষিকী (বই ও ম্যাগাজিন) (৮) প্রযুক্তির অবস্থা (৯) লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগ।

উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো যে দেশের যত ভাল সে দেশ তত উন্নত। তবে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই উন্নয়নের ক্ষেত্রে কতগুলো বাধা কাজ করে যথা জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি, নিরক্ষরতার অধিক হার, অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা ও চাকরির অনিশ্চয়তা বা বেকারত্ব উন্নত চেতনার অভাব, খাদ্যের অপর্যাপ্ততা, সামাজিক ও জাতীয় সমন্বয়ের স্বল্পতা এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা। জনসাধারণকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে পারলে ঐ বাধাগুলো দূর করা সম্ভব।

প্রতিটি মানুষ দৈনন্দিন জীবনপ্রবাহ সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক জীবনযাত্রা হতে ব্যবহারিক শিক্ষা পেয়ে থাকে। তাই শিক্ষাকে ব্যক্তিক, সামাজিক ব্যবহারিক এবং সামগ্রিক উন্নতি বিকাশের একটি প্রধান মাধ্যম হিসেবে ধরা উচিত। শিক্ষা পেলে প্রতিটি লোকই সমাজের সাথে খাপ খেয়ে চলতে পারবে। বাংলাদেশে এ ধরনের শিক্ষা প্রবর্তন করা উচিত যাতে শিক্ষার্থীরা সমাজের নির্ভরশীল নাগরিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। যেহেতু ব্যক্তিই সমাজ ও পরিবেশ হতে বাস্তব শিক্ষা বেশি পেয়ে থাকে সুতরাং শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবেশ ও সমাজের প্রতি প্রাধান্য দেয়া উচিত।

জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে জীবনব্যাপী, দৈনন্দিন কাজের মধ্য দিয়ে মানুষ পড়ে, শুনে, স্পর্শ করে, স্বাদ নিয়ে, অনুসরণ করে এবং ঠেকে যা শিখে তা অপ্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা। ঐ শিক্ষা প্রক্রিয়া মানুষের জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত চলতে থাকে এ শিক্ষার পাঠশালা হচ্ছে পরিবার, সমাজ, প্রকৃতি পরিবেশ ও কাজের ক্ষেত্র। পরিবার হলো শিক্ষার প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান। পারিবারিক ধর্ম থেকে জন্ম হয় বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের। অপরদিকে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক শিক্ষার প্রয়োজন। এ শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু, শিক্ষা পদ্ধতি এবং ভাষাবেগের সাথে শিক্ষার্থীর সম্বন্ধই প্রধান।

এছাড়াও বাংলাদেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করে তুলতে হলে অন্তত দু ধরনের সম্পদের বেশি প্রয়োজন। যেমন প্রাকৃতিক ও জনসম্পদ। এদেশে প্রাকৃতিক সম্পদ অত্যন্ত সীমিত যা দিয়ে অন্যান্য সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়। অবশ্য বাংলাদেশে জনসম্পদ রয়েছে প্রচুর। এদেরকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

এজন্য চাই সঠিক শিক্ষা। একমাত্র শিক্ষাই পারে এ জনসম্পদকে সুদক্ষ জনশক্তিতে পর্যবসিত করতে। এ শিক্ষা হবে দেশের সর্বস্তরের মানুষের জন্য এবং তাদের চাহিদা ভিত্তিক এই দেশের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে অনেক বৈষম্য বিদ্যমান। শিক্ষা ও সম্পদের অসম বন্টন এ বৈষম্যের অন্যতম কারণ। শিক্ষাই পারে এ অব্যবস্থা দূর করতে। তাই সুষ্ঠু ও সুপরিকল্পিত শিক্ষার মাধ্যমে দেশের প্রতিটি স্তরের লোকদেরকে শিক্ষিত করে তুলতে পারলে ব্যক্তিক, সামাজিক ও অন্যান্য উন্নতি ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

পৃথিবীতে সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে না এরূপ জীবের সংখ্যা অতি নগণ্য। কিন্তু পরিসরে আঠারো হাজার সৃষ্টি জীবের ভিতর মানবজাতি জ্ঞানে গুণে ও কাজে অত্যন্ত পারদর্শী বলে এরা সবচেয়ে উত্তম। অতীতে এরা দলবদ্ধভাবে কিছু নিয়মকানুনের অধীনে বসবাস করত। পরবর্তীতে ছোট ছোট সমাজে এবং সমাজগুলো রাষ্ট্রে রূপ নেয়। দ্বন্দ্ব-কলহে ভরা এসব রাষ্ট্র নিয়ে আমাদের পৃথিবী। এর রাষ্ট্রগুলো বিভিন্ন ধরনের সরকার দ্বারা পরিচালিত। আজও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রায় বড় বড় শহরগুলোর আনাচে-কানাচে, রেললাইন-স্টেডিয়াম ও রাস্তার ধারে, পরিত্যক্ত ভাংগা বাড়ি, ঘাস ও নোংরা জায়গায় ছিন্নমূল মানুষেরা খড়, লতা-পাতা, পলেথিনের কাগজ এবং বাঁশের চাটাই দিয়ে তৈরি খুপরিতে কোনমতে মাথা গোজে থাকে। রৌশন কাদের চৌধুরী ছিন্নবাসীদের উপর গবেষণা করে 'বস্তিত অব ঢাকা' নামে একটি বই লিখেন। এতে দেখা যায় যে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এ ছিন্নমূলদের বৎসামান্য উন্নয়ন হলেও বেশির ভাগই সভ্যতার আলো থেকে বঞ্চিত। অথচ এরাই ঐসব শহরের প্রায় এক চতুর্থাংশ।

—আবদুস সামাদ